Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 62 & 63
April-June & July-Sept. 2020

ইসলামী ও প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য : তুলনামূলক পর্যালোচনা

Objectives of Punishment under Islamic and Conventional Law : A Comparative Analysis

Noor Mohammad*

ABSTRACT

Peace loving people of the world is extremely anxious about the overwhelming proliferation of crimes. Pre-Islamic period or Aiyam-i-Jahiliya also witnessed devastating criminal tendencies among Arabs. With the arrival of Islam and its effective criminal regulation the rate of crimes was reduced substantially and the barbaric Arab nation became most civilized. History bore the testimony that the effective implementation of Islamic regulation in other parts of the world in later period had also ensured such progress. Not surprisingly enough, conventional jurisprudence has also developed several theories of punishment. Due to the flaws regarding determination of punishment and implementation expected result cannot be achieved. This article has ventured to sketch a comparative analysis of objectives of punishment under Islamic and Conventional law. To effectuate this purpose, comparative methodology is employed. Though there exists several similarities between the objectives of Islamic and Conventional law the objectives advanced by Islamic Jurisprudence, in an overall scale, are evidently more logical and functional. The underlying reason is that the one of the prime objectives of punishment under Islamic law is to reform the persons having criminal propensity and thereby prevent the proliferation of crimes. Moreover, other prime objectives include securing public welfare and security through the establishment of justice.

Keywords : Islamic law; crime; punishment; public welfare; public security.

* Noor Mohammad is an Assistant Professor in the Department of Islamic Studies, BAF Shaheen College Chattogram & Ph.D researcher, Department of Islamic Studies, University of Chittagong, email: noormohammad.cu@gmail.com.

সারসংক্ষেপ

বিশ্বজুড়ে শান্তিকামী মানুষ অপরাধের অপ্রতিরোধ্য বিস্তার নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন। ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগেও আরবদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর অপরাধ দমনে শাস্তির বিধান প্রণীত হলে অপরাধের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায় এবং বর্বর আরব জাতি সবচেয়ে সভ্য জাতিতে পরিণত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পরবর্তীতে যেসব রাষ্ট্রে এ আইন অনুসৃত হয়েছে সেখানেও আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অবশ্য প্রচলিত আইনেও শাস্তির বেশ কিছু তত্ত্ব রয়েছে। কিন্তু শাস্তি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জিত হয় না। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য তুলনামূলক পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। উভয় আইনে শাস্তির উদ্দেশ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও সার্বিক বিবেচনায় ইসলামী আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত বলে প্রমাণিত। কারণ ইসলামী আইনে শাস্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, অপরাধপ্রবণ মানুষকে সংশোধনপূর্বক অপরাধের বিস্তার রোধ করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনকল্যাণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

মূল শব্দগুচ্ছ : ইসলামী আইন; অপরাধ; শাস্তি; জনকল্যাণ; জননিরাপত্তা।

ভূমিকা

অপরাধ সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। অপরাধের বিস্তৃতি মানবজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ফলে অপরাধ প্রতিরোধমূলক বিধিবদ্ধ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়, যার চূড়ান্ত পর্যায় হলো শাস্তি। প্রতিটি সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে অপরাধ দমনে শাস্তির বিধান রয়েছে। মানবরচিত আইনে শাস্তির বিধান প্রণয়নকালে সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ লক্ষ্য স্থির করতে না পারায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলেও স্থায়ী সমাধান হয় না। কখনও কখনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ায় সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত হয় না। এমনকি ক্ষমতার পালাবদলে এসব আইন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। প্রচলিত আইনে অপরাধীকে সংশোধন করার প্রতি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বারোপ করায় নির্দিষ্ট মেয়াদে শাস্তি ভোগ করার পর নতুন করে অপরাধে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। কোনো ব্যক্তি ঠুনকো অজুহাতে দীর্ঘ মেয়াদে শাস্তি ভোগ করতে থাকে আবার কেউ ধ্বংসাত্মক অপরাধে লিপ্ত হয়েও জনসমক্ষে ঘুরে বেড়ায় কিংবা কারাগারে গেলেও বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। এক্ষেত্রে 'ইসলামী দণ্ডবিধি' অপরাধমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ একটি সমাজ উপহার দিতে সক্ষম। কারণ ইসলামী আইনে শাস্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো- প্রকৃত অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে অপরাধপ্রবণতা রোধ করা এবং মানবজীবনের কতিপয় মৌলিক বিষয় সংরক্ষণপূর্বক জনকল্যাণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইসলামী আইন এবং প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে করণীয় সম্পর্কে দিকেনির্দেশনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। সাথে সাথে

প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলামী আইনে শাস্তির উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি পুনঃগঠিত করা গেলে দণ্ডবিধির প্রকৃত সুফল অর্জিত হবে।

শাস্তির আভিধানিক অর্থ

শাস্তি অর্থ সাজা, দণ্ড, নিগ্রহ, অত্যাচার ইত্যাদি (Hoque 2005, 1077)। শাস্তির আরবী প্রতিশব্দ হলো العقاب، العقوبة، المعاقبة যার আভিধানিক অর্থ- মন্দ প্রতিফল, পাকড়াও, পাপের শাস্তি, প্রতিশোধ (IFA 2010, 2/377)। ইংরেজিতে punishment, punition, penalty, sanction, retribution (Baalbaki 1995, 769)। মন্দ কাজ করার দায়ে ব্যক্তিকে যে প্রতিফল দেয়া হয় তা-ই শাস্তি (العقاب)। যেমন কেউ যখন অপরাধের দায়ে কাউকে পাকড়াও করে তখন বলে تَعَقَّبْتُ الرجلَ (Ibn Manzūr ND, 1/619)। কবি নাবিগা বলেন-

وَمَنْ عَصَاكَ فَعاقِبْهُ مُعاقَبَةً تَنْهَى الظَّلُومَ ولا تَقْعُدْ على ضَهَدِ

যে তোমার অবাধ্যাচরণ করল, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও, যেন অবিচার দূর হয়। তবে (শাস্তি দিতে গিয়ে) তুমি তার প্রতি অবিচার করো না। (al-'Atībī 1427H, 1/565)

শাস্তি তথা অপরাধের প্রতিফল কষ্টকরই হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর বাণী,

﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾

অতঃপর সে তার কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই হলো তার কর্মের পরিণাম। (Al-Qurān, 65:9)

কেউ কেউ ইহকালীন শাস্তিকে عقوبة আর পরকালীন শাস্তিকে عقاب হিসেবে অভিহিত করেছেন। (al-Mawsū'ah 1427H, 30/269)

শাস্তির শাব্দিক পরিচয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শাস্তি হলো, নিষিদ্ধ কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রতিফল, যার মূল উপাদান কষ্ট দেয়া। আরবীতে শাস্তির একাধিক প্রতিশব্দ থাকলেও عقوبة/عاقبة শব্দই অধিকতর ব্যবহৃত।[১]

শাস্তির পারিভাষিক সংজ্ঞা

শাস্তি হলো ব্যক্তির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের 'প্রতিফল' হিসেবে বিধিবদ্ধ কষ্টদায়ক কোনো ব্যবস্থা। শাস্তির পরিচয় প্রসঙ্গে যেসব অভিমত পাওয়া যায় তার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. অপরাধের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিফলকে শাস্তি বলে। (IFA 2004, Sec:16)

২. শাস্তি বলতে কাউকে তার অপকর্মের জন্য শারীরিক বা মানসিক যাতনা বা উভয়বিধ কষ্ট দেয়াকে বোঝানো হয়। (Ali 2015, 24)

১. عقاب ছাড়াও শাস্তির আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে جزاء، عذاب، نكال ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

৩. هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية "অপরাধের কারণে মানুষ যে কষ্ট ভোগ করে তাকে শাস্তি বলে"। (al-'Atībī 1427H, 1/565)

৪. আব্দুল কাদীর আওদাহ বলেন, العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع "শাস্তি হলো, শরী'আত প্রবর্তক (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল)-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে জনগণের কল্যাণে বিধিবদ্ধ প্রতিফল"। ('Audah ND, 2/166)

৫. প্রচলিত অর্থে- নীতিগর্হিত কোনো কাজ বা আইন ভঙ্গের জন্য অপরাধীর ওপর কষ্টদায়ক কোনো ব্যবস্থা আরোপই হচ্ছে শাস্তি। (Khan & Qader 2014, 312)

৬. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিবোধ বিরোধী বা আইন বিরোধী কোনো কাজ করলে তার জন্য আদালত কর্তৃক অপরাধীর প্রতি কষ্টদায়ক যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আরোপ করা হয় তাকে শাস্তি বলে। (Uddin 2017, 295)

শাস্তির সংজ্ঞায় প্রদত্ত উপরোক্ত অভিমতসমূহ পর্যালোচনা করলে যেসব বিষয় ফুটে ওঠে তা হলো-

- শাস্তি 'বিধিবদ্ধ আইন' দ্বারা নির্ধারিত;
- শাস্তির স্বরূপ হলো কষ্ট দেয়া;
- ইসলামী আইনে শাস্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন;
- ইসলামী আইনে শার'ঈ বিধান লঙ্ঘন করলে শাস্তি অবধারিত হয় এবং
- প্রচলিত আইনে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন ভঙ্গ করলেই কেবল শাস্তি দেয়া যায়।

ইসলামী আইনে শাস্তির ধরন ও তার হিকমত

প্রচলিত আইনে নির্ধারিত শাস্তির সাথে ইসলামী আইনের কিছু শাস্তির মিল রয়েছে। তবে ইসলামী আইনে অপরাধের শাস্তি হিসেবে এমন কিছু পরিভাষা রয়েছে, যার মধ্যে শাস্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন-

১. হুদূদ : কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত কতিপয় অপরাধের শাস্তি হুদূদের আওতাভুক্ত।[২] হুদূদের একবচন 'হদ্দ' শব্দের অর্থ হলো রোধ করা বা বাধা প্রদান করা। যেমন বলা হয়, الحدود رادعة مانعة "হুদূদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, বাধা প্রদানকারী" (Rawās & Sādiq 1988, 1/266)।

২. কিসাস : প্রাণহানি কিংবা অঙ্গহানিমূলক অপরাধের দায়ে প্রদত্ত শাস্তির জন্য ইসলামী আইনে ব্যবহৃত পরিভাষা হলো 'কিসাস'। যার অন্যতম অর্থ- المماثلة بين العقوبة والجناية "অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বা সাদৃশ্য বিধান করা"

২. হুদূদের আওতাভুক্ত অপরাধ হলো: চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ। তবে কোনো কোনো ফকীহ ধর্মান্তর ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তিকেও হদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন। (Ali 2009, 27)

(Ibid, 1/438)। এখানেও শাস্তির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতার মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য দূর করা।

৩. তা'যীর : যেসব অপরাধের শাস্তি শরী'আত নির্দিষ্ট করে দেয়নি, সেসব শাস্তির জন্য ব্যবহৃত পরিভাষা হলো তা'যীর। যার অর্থ হলো তিরস্কার করা, নিষেধ করা, বাধা দেয়া, ফিরিয়ে রাখা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি (Ibn Manzūr ND, 4/561)। যেহেতু শাস্তি অপরাধীকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে এবং পুনঃপুন অপরাধ করা থেকে বারণ করে, ফিরিয়ে রাখে, তাই শাস্তিকেও তা'যীর বলা হয় (Ali 2015, 29)। আর ইসলামী আইনে শাস্তির উদ্দেশ্যও অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করা।

৪. কাফফারা : শব্দটি كفر থেকে নির্গত। যার অর্থ আবৃত করা, ঢেকে রাখা। কোনো অপরাধের শরী'আহসম্মত কাফফারা সেই গুনাহকে আবৃত করে রাখে এবং সেই অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে (Rahīm 2010, 220)। অন্যান্য পরিভাষার মতো এটিও শাস্তির উদ্দেশ্যকে ফুটিয়ে তোলে।

প্রচলিত আইনে শাস্তির ধরন

প্রচলিত আইনে শাস্তির পাঁচটি ধরন রয়েছে। যেমন মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সশ্রম/বিনাশ্রম কারাদণ্ড, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং অর্থদণ্ড (PC- 1860; Sec : 53)। এছাড়া বেত্রদণ্ডের বিধান থাকলেও (CRPC- 1898, 32) বাংলাদেশে তা কার্যকরের দৃষ্টান্ত নেই। প্রচলিত আইনে শাস্তির জন্য ব্যবহৃত এসব পরিভাষায় বাহ্যত অপরাধীকে কষ্ট দেয়া কিংবা আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি ফুটে ওঠে। কিন্তু শাস্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

ইসলামী আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য ও মাকাসিদুশ শারী'আহ

ইসলামী আইনের কোনো দিকই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। শাস্তির বিধান প্রণয়নেও সাধারণ ও বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। ইসলামী আইনে শাস্তির সাধারণ উদ্দেশ্য ও মাকাসিদুশ শরী'আহর তাৎপর্য অভিন্ন। কারণ মুসলিম মনীষীগণ ইসলামী শরী'আতের যে লক্ষ্যমাত্রা বর্ণনা করেছেন ইসলামী দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা পুরোমাত্রায় অর্জিত হয়। ইসলামী শরী'আতের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি.] রা. বলেছেন,

> أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد
>
> শার'ঈ বিধানাবলি প্রবর্তন করা হয়েছে কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ দূর করার জন্য। (Al-Shātibī 1997, 1/311)

মাকাসিদুশ শরীআহ'কে তিন প্রকারে বিভক্ত করে তিনি বলেন,

> تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية.
>
> সৃষ্টি তথা মানুষের জন্য শরী'আতের উদ্দেশ্যসমূহ সংরক্ষণের জন্যেই এর যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণীত। আর এ উদ্দেশ্য তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথমত, অতি অত্যাবশ্যকীয়; দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় এবং তৃতীয়ত, সৌন্দর্যবর্ধক। (Ibid, 2/17)

ইসলামী আইনে প্রণীত দণ্ডবিধির মাধ্যমে এ তিনটি উদ্দেশ্য সংরক্ষিত হয়। যেমন-

জরুরিয়াত তথা অতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহের সংরক্ষণ

জরুরিয়াত হলো ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণের জন্য সেসব অতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, যা না হলে পার্থিব কল্যাণ স্থায়ী হয় না; বরং জনজীবনে বিপর্যয় ও অরাজকতা দেখা দেয়, আর পরকালে মুক্তি ও সফলতা থেকে বঞ্চিত এবং সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হতে হয় (Ibid, 2/17-18)। এ ধরনের অতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় পাঁচটি। যথা:

১. দীনের সংরক্ষণ;
২. জীবনের নিরাপত্তা;
৩. বংশধারা রক্ষা;
৪. বিবেকের সুরক্ষা এবং
৫. সম্পদের নিরাপত্তা।

এ পাঁচটি ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করাকে- ইসলামী আইনে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে (Abū Jahrah 1998, 31)। ইসলামী আইনে নির্ধারিত শাস্তির মাধ্যমেই অতি প্রয়োজনীয় এসব বিষয় সুরক্ষা পায়। যেমন ধর্মত্যাগের দণ্ডের মাধ্যমে দীনের সংরক্ষণ, কিসাসের মাধ্যমে জীবনের নিরাপত্তা, ব্যভিচারের দণ্ডের মাধ্যমে বংশধারা রক্ষা, চুরি ও ডাকাতির শাস্তির মাধ্যমে সম্পদের নিরাপত্তা এবং মদ্যপানের শাস্তি নির্ধারণের মাধ্যমে বিবেকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

হাজিয়াত তথা প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের সংরক্ষণ

হাজিয়াত হলো পরিপূরক কল্যাণ। সচ্ছলতা অর্জন এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপনে অন্তরায়- এমন সমস্যাদি দূর করার প্রয়োজনীয় উপকরণ হাজিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। জীবনের গতি স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে হাজিয়াত সংরক্ষণ 'মাকাসিদুশ শারী'আহ'র গুরুত্বপূর্ণ দিক। দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে দিয়াতের সুযোগ 'হাজিয়াত' পূরণে সহায়ক (Al-Shātibī 1997, 2/22)। হত্যার শিকার হয়ে পরিবারের সক্ষম ব্যক্তির উপার্জন বন্ধ হলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে আর্থিক দৈন্য দেখা দেয়। আর কিসাসের পরিবর্তে দিয়াতের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতিপূরণের সুযোগ গ্রহণ করলে অভাব-অনটন কিছুটা হলেও লাঘব হয়।

তাহসিনিয়্যাত

তাহসিনিয়্যাত অর্থ শোভাবর্ধক। জীবনের প্রয়োজনীয় দিকসমূহ পূরণের পর জীবনকে আরও সুন্দর, পরিপাটি ও পূর্ণতা দানের জন্য সহায়ক বিষয়াদি তাহসিনিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে তাহসিনিয়্যাত হলো- দাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তির মাধ্যমে কিসাস নিষিদ্ধ করা (Ibid, 2/22-23)। জাহিলী যুগে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত ও প্রভাবশালী গোত্রের কোনো দাস অপর গোত্রের দাসের হাতে নিহত হলেও প্রতিশোধ হিসেবে তারা স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত, যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। তাদের এ অবিচারের বিপরীতে ইসলাম 'স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি এবং ক্রীতদাসের পরিবর্তে ক্রীতদাস' (Al-Qurān, 2:178) কিসাসের এ নীতি প্রবর্তন করে সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

অতএব বলা যায়, 'মাকাসিদুশ শরীআহ'র যে তিনটি মৌলিক ক্ষেত্র রয়েছে ইসলামের দণ্ডবিধান তা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী আইনে শাস্তি প্রবর্তনের বিশেষ উদ্দেশ্য

সৃষ্টিজগতের কারও প্রতি আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং কেউ ইবাদত করলে যেমন তাঁর কোনো উপকার হয় না; তদ্রূপ কেউ তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলে কিংবা অপরাধ করলে তাতেও তাঁর কোনো ক্ষতি হয় না। এতদসত্ত্বেও যেসব বিশেষ উদ্দেশ্যে সমাজে সংঘটিত অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে তা হলো:

জনকল্যাণ ও জননিরাপত্তা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الدين النصيحة "দীন হলো কল্যাণকামিতা" (Muslim ND, 205)। তিনি আরও বলেছেন, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "প্রকৃত মুসলিম তিনি, যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলিম নিরাপত্তা লাভ করে" (Al-Bukhārī 1987, 10)। আলোচ্য হাদীসদ্বয়ের ভাষ্যমতে, কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা দীন ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইসলামী আইনে দণ্ডবিধির মূল লক্ষ্যও তা-ই। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ আব্দুল কাদীর 'আওদাহ [মৃ. ১৩৭৩ হি.] রহ. বলেন,

> فأساس العقاب هو حماية المصلحة العامة وصيانة النظام العام
>
> শাস্তির ভিত্তি হলো জনসাধারণের কল্যাণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সর্বজনীন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ('Audah ND, 1/162)

আর এটি কার্যকর সম্ভব বিভিন্ন অপরাধ, অরাজকতা প্রভৃতি শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী কাজ হতে সমাজকে সুরক্ষামূলক আইন প্রণয়ন ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে। ইসলামী আইনে শাস্তির বিধান এ লক্ষ্য পূরণে সক্ষম। যেমন চুরি ও ডাকাতির শাস্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো, মানুষের সম্পদের নিরাপত্তার পাশাপাশি যে কেনো ধরনের নাশকতা, ধ্বংসাত্মক ও অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস থেকে বিরত রেখে সর্বসাধারণ ও রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (Ahmad 2006, 79)

দণ্ডবিধি সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে হওয়া উচিত। ইসলামী শরী'আতের প্রতিটি কার্যক্রমও তাই। ইসলামী শরী'আতের দণ্ডবিধি প্রসঙ্গে ইবনে 'আশূর রহ. বলেন, এটি নির্যাতনমূলক নয়; বরং এর পুরো প্রক্রিয়াটি জনগণের সামগ্রিক কল্যাণেই আবর্তিত (Ibn 'Āsūr 2005, 206)। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, সায়্যিদুনা উমার ফারূক রা.-এর সময়কার একটি ঘটনায়। এ সময় আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে উমার ফারূক রা. চুরির দায়ে হাত কাটার শাস্তি মওকুফ করে দিয়েছিলেন (Ibn Qudāmah ND, 4/71)। এতে দেখা যায়, জনকল্যাণ তথা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণকে দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মূলত শাস্তিসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে মানুষের কুপ্রবৃত্তি যা অপছন্দ করে (সৎ কাজ) তা করতে তাকে বাধ্য করার জন্য। কেননা, তাতে জনগণের সামষ্টিক কল্যাণ নিহিত

রয়েছে। আর মানুষের কুপ্রবৃত্তি যা পছন্দ করে (অসৎ কাজ) তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত রাখার জন্য। কেননা, কুকর্মে রয়েছে সমাজের বিকৃতি ও অকল্যাণ। (Al-Rizkī 2008, 113)

ইসলামী আইনে অপরাধের শাস্তির উদ্দেশ্য যে সমাজকে শৃঙ্খলার আওতায় রাখা তার আরেকটি প্রমাণ হলো, অপরাধ প্রকাশ পেলে এবং অভিযোগ দায়ের করা হলেই অপরাধের শাস্তি কার্যকর করা হয়। কারণ অপরাধ প্রকাশ পেলে শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি হয়। আর অভিযোগ দায়েরের পর শাস্তি নিশ্চিত না করলে অপরাধের প্রসার ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

> تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب
>
> তোমাদের সংঘটিত হদ্দযোগ্য অপরাধসমূহ (আমার কাছে আসার আগে) নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নাও। কারণ আমার কাছে হদ্দের অভিযোগ আসলে তা কার্যকর করা আবশ্যক হয়ে যায়। (Abū-Dāūd ND, 4378)

সুতরাং বলা যায়, ইসলামী আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য হলো সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে জনকল্যাণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অপরাধপ্রবণতা রোধ করা

ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, সীমালঙ্ঘনমূলক রক্তপাত ঠেকানো এবং কিসাসের মাধ্যমে অপরাধীকে সংযত রেখে রক্তপাত (কিসাসের মধ্যে) সীমিত রাখা (Ibn al-'Arabī 1424H, 2/88)। ইসলামের শাস্তি বিধান অপরাধের সাথে ভারসাম্যমূলক। এতে অপরাধ অনুপাতে শাস্তি দেয়া হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাস্তি এখানে নেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

> ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾
>
> যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (Al-Qurān, 16:126)

তাছাড়া এ শাস্তি দানে যেন কেউ সীমালঙ্ঘন না করে সে বিষয়ে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন,

> ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾
>
> আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিকারের (কিসাস গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার (প্রতিশোধ নেয়ার) ব্যাপারে সে যেন সীমালঙ্ঘন না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই। (Al-Qurān, 17:33)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী শফী রহ. বলেন, প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী তথা উত্তরাধিকারী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কিসাস নিতে চাইবেন সে পর্যন্ত শরী'আতের আইন তার

পক্ষে থাকবে। কিন্তু যদি প্রতিশোধের স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কিসাসের সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে মাযলুমের পরিবর্তে যালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। (Shafī 1413H, 776)

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা গেলে যে অপরাধের মাত্রা হ্রাস পায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইসলামের সোনালি যুগে। যেমন ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বাকর রা.-এর খিলাফতকালে মদীনার বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন সায়্যিদুনা উমার ফারূক রা.। এ সময় পুরো এক বছর বিবাদ-বিসম্বাদের কোনো ঘটনাই তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়নি (Ali 2013, 344)।

তাছাড়া উমার ফারূক রা.-এর শাসনামলে কুফার প্রধান বিচারপতি ছিলেন সালমান ইবনু রাবী'আ আল-বাহিলী। একবার তার আদালতে প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোনো মামলা দায়ের হয়নি। (Ibn 'Abd al-Barr 1412H, 2/632)

অনুরূপভাবে ইসলামিক অনুশাসনে পরিচালিত ঐতিহাসিক রাষ্ট্রসমূহে অপরাধের প্রবণতা কম ছিল। কারণ সেখানে আইন সকলের প্রতি সমানভাবে প্রয়োগ করা হতো, ন্যায় কাজের দ্বার অবারিত থাকত এবং অন্যায় কাজের পথ বন্ধ থাকত (Uddin, 2017, 295)।

'ইসলামী দণ্ডবিধি'র আলোকে পরিচালিত সোনালি যুগে অপরাধ যখন প্রায় শূন্যের কোটায় তখন মানবরচিত 'দণ্ডবিধি'র আলোকে পরিচালিত রাষ্ট্রে অপরাধের চিত্র ভয়াবহ। যেমন-

বাংলাদেশে অপরাধের পরিসংখ্যান (২০১০-২০১৮)

ক্রম	সাল	চুরি ও সিঁধেল চুরি	ডাকাতি ও দস্যুতা	খুন	নারী ও শিশু নির্যাতন	অপহরণ	মোট
১	২০১০	১১৬৩০	১৭১৫	৩৯৮৮	১৭৭৫২	৮৭০	৩৫৯৫৫
২	২০১১	১২০০৭	১৭১৯	৩৯৬৬	২১৩৮৯	৭৯২	৩৯৮৭৩
৩	২০১২	১১৫২৫	১৫৫৭	৪১১৪	২০৯৪৭	৮৫০	৩৮৯৯৩
৪	২০১৩	১০৬৪৪	১৬৩৪	৪৩৯৩	১৯৬০১	৮৭৯	৩৭১৫১
৫	২০১৪	১০৪৬৯	১৮০৬	৪৫১৪	২১২৯১	৯২০	৩৯০০০
৬	২০১৫	৯৩১৬	১৪২৫	৪০৩৭	২১২১০	৮০৫	৩৬৭৯৩
৭	২০১৬	৮৩২৩	১১৩০	৩৫৯১	১৮৪৪৬	৬৩৯	৩২১২৯
৮	২০১৭	৭৯৯৬	৯৯৩	৩৫৪৯	১৭০৭৩	৫০৯	৩০১২০
৯	২০১৮	৭৬৯৮	৮২৪	৩৮৩০	১৬২৫৩	৪৪৪	২৯০৪৯

সূত্র : বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সালভিত্তিক অপরাধের পরিসংখ্যানের আলোকে চিত্রায়িত।[৩] (BD Police, March 26, 2020)

৩. এটি কেবল পুলিশ বাহিনীর কাছে নথিভুক্ত অপরাধের পরিসংখ্যান। প্রকৃতপক্ষে অপরাধের চিত্র আরও অনেক দীর্ঘ। কারণ অনেক অপরাধ ধামাচাপা দেয়া হয়, সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করা

ইসলামী দণ্ডবিধি ও প্রচলিত দণ্ডবিধি অনুসৃত সময়ের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা গেলে অপরাধপ্রবণতা প্রত্যাশিত হারে হ্রাস পায়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তিময় পরিবেশ বিরাজ করে।

দৃষ্টান্ত স্থাপন করা

ইসলামী আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্ট দেয়া নয়; বরং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকরের মাধ্যমে অপরাধী, অপরাধপ্রবণ মানুষ ও অন্যান্যদেরকে নিরুৎসাহিত করা। দাউদ আ.-এর সময় শনিবারে মাছ ধরার বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করার দায়ে প্রদত্ত শাস্তি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾

আমি তা (শাস্তি) সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ করেছি। (Al-Qurān, 2:66)

একজনের শাস্তি দেখে অন্যরা যেন সংশোধন হতে পারে এবং অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা গ্রহণ করে- এজন্য ইসলাম একদল প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতিতে অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করার বিধান দিয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

এবং মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (Al-Qurān, 24:2)

জনসমক্ষে শাস্তি কার্যকর করাকে বাহ্যত নৃশংস মনে হলেও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে এ পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ। কারণ এতে অপরাধপ্রবণ মানুষের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হয়। সমাজের কাছে এ বার্তা দেয়া যায় যে, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। অপরাধী যে-ই হোক না কেন বিচারের আওতায় আসতেই হবে। প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতিতে শাস্তি কার্যকর করার বাধ্যবাধকতার কারণে পর্দার অন্তরালে কাউকে ছাড় দেয়ার সুযোগ থাকে না। সবল-দুর্বল, আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যায়।

প্রাণ রক্ষা

ইসলামী আইনে অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদসহ যেসব বিধান রয়েছে এর দ্বারা প্রাণহানি নয়; বরং প্রাণরক্ষা করা-ই উদ্দেশ্য। ইমাম শা'বী ও কাতাদাহ রহ.-এর সূত্রে ইমাম আল-কুরতুবী [৬০০-৬৭১ হি.] রহ. বলেন,

> জাহিলী যুগের লোকেরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী ও শয়তানের অনুগত। তাদের মধ্য থেকে যদি সম্মানিত ও প্রভাবশালী গোত্রের কোনো দাস নিহত হতো এবং হত্যাকারী অপর গোত্রের দাস হতো তখন তারা বলত, আমরা তার প্রতিশোধে

হয়, প্রতিপক্ষের ভয়ে মামলা দায়ের হয় না, আইনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা জটিলতার কারণে ভিকটিম আইনের দ্বারস্থ হয় না ইত্যাদি।

স্বাধীন একজনকেই হত্যা করব। আবার কোনো নারী নিহত হলে বলত, তার প্রতিশোধে একজন পুরুষকে হত্যা করব। যদি সাধারণ কোনো ব্যক্তি নিহত হতো তখন বলত, তার প্রতিশোধে আমরা সম্মানিত ব্যক্তিকেই হত্যা করব। (Al-Qurtubī 2003, 2/245)

তাছাড়া নিহত ব্যক্তি গোত্রের নেতা বা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হতো না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু তিন বা আরও বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হতো। কেউ কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না; বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করত। (Shafī 1413H, 776)

হত্যার প্রতিশোধে জাহিলী যুগে প্রচলিত বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড বন্ধের মাধ্যমে অন্যদের প্রাণ রক্ষা করে ইসলামী দণ্ডবিধি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। (Al-Qurān, 2: 179)

এ আয়াতে হত্যার দণ্ড বর্ণনার পাশাপাশি শাস্তির একটি মৌলিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। কিসাস তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যার দণ্ডকে জীবন বলা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জীবন রক্ষার জন্য কিসাসকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করতে ইচ্ছা করবে সে যখন জানবে হত্যার শাস্তি হিসেবে তাকেও হত্যা করা হবে, তখন সে হত্যাকাণ্ড ঘটাবে না। ফলে নিহত ও হত্যাকারী দুজনের জীবনই রক্ষা হবে। পক্ষান্তরে অন্যদের জীবনও রক্ষা হবে এভাবে যে, হত্যাকাণ্ড ঘটলে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে উভয়পক্ষ ঝগড়া-বিবাদে এমনকি যুদ্ধেও জড়িয়ে যেতে পারে, যেখানে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া হত্যার কিসাস কার্যকর করতে দেখে অন্য কেউ হত্যার অভিপ্রায় করবে না (Al-Damasqī 1419H, 3/228)। এজন্য একজনকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা এবং একজন রক্ষা করা সকল মানুষকে রক্ষা করার শামিল উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

এ কারণেই বানূ ইসরাঈলের প্রতি বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। (Al-Qurān, 5:32)

ইসলামী আইনে কিছু অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদকে কেউ কেউ অমানবিক বলার প্রয়াস চালান। প্রকৃতপক্ষে অপরাধী তার অপরাধ দ্বারা যে ক্ষতি করে, সে হিসেবে এ শাস্তি যুক্তিসঙ্গত। কারণ এ ধরনের শাস্তির পরিবর্তে কেবল কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হলে কারাভোগ কিংবা অর্থের বিনিময়ে পার

পাওয়ার পর অপরাধপ্রবণ মানুষ আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠতে পারে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কিংবা অঙ্গচ্ছেদের মতো শাস্তি বিধিবদ্ধ হওয়ায় 'চিরতরে নিশ্চিহ্ন হওয়া কিংবা আমৃত্যু শাস্তির ক্ষত বয়ে বেড়ানো'র ভয়ে অপরাধপ্রবণ মানুষ নিজেকে সংযত রাখবে। এতে অন্যের প্রাণ রক্ষার পাশাপাশি নিজেও রক্ষা পায়।

পবিত্রকরণ ও সংশোধন

ইসলামী আইনে দণ্ডবিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, অপরাধীকে পবিত্র ও সংশোধন করা (Al-Wad'ān 2002, 28)। কারণ শাস্তি তার অন্তর্নিহিত হুমকি, হুঁশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা মানবীয় স্বভাবের সংশোধন সম্পন্ন করে থাকে। মানুষ যখন তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বার্থের পরিণামে অবধারিত শাস্তিসমূহের দিকে দৃষ্টি দেয়, তখন স্বভাবগতভাবেই সে শাস্তিকে অপছন্দ করে (Al-Rizkī 2008, 113)। দণ্ড ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হয়। পরবর্তীতে আর অপরাধে লিপ্ত না হলে, পরকালীন শাস্তি থেকেও মুক্তি পায়। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে- শিরক, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি না করার বায়'আত তথা অঙ্গীকার করানোর পর বলেন,

فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বায়'আতের শর্তসমূহ) পূর্ণ করে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে। আর যে ব্যক্তি এসবের কোনো একটি (অপরাধ) করে এবং তার জন্য শাস্তি দেয়া হয়, তবে এটা তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। (Al-Bukhārī 1987, 6402)

কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় প্রথমবার অপরাধে লিপ্ত হলেও (মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্যান্য) শাস্তি কার্যকর হওয়ার পর ব্যক্তি যখন দেখে যে এ শাস্তি তার জন্য কাফফারা, তখন সে পাপ মোচনের নিশ্চয়তা পেয়ে নিজেকে সংশোধন করে এবং দ্বিতীয়বার শাস্তির ভয়ে অপরাধ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে।

অপরাধীর ওপর শাস্তি কার্যকর করার পর ব্যক্তিকে অপরাধের দোষ থেকে মুক্ত মনে করে ইসলামী শরী'আত মনস্তাত্ত্বিকভাবে- যে পরিবেশের মধ্যে পড়ে সে অপরাধ করেছিল সেখান থেকে বের করে সেই পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে সে স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হতে পারবে (Ali 2015, 33) যা মূলত তাকে পবিত্রকরণ ও সংশোধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এমনকি দণ্ডপ্রাপ্তকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ইসলাম। সায়্যিদুনা আবূ বাকর রা.-এর খিলাফতকালে এ ধরনের একটি ঘটনা হলো:

আশ'আস ইবনু কায়স যখন মুরতাদ হিসেবে বন্দী হয়ে আসে এবং আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তখন আবূ বাকর রা. কেবল তার প্রাণই রক্ষা করেননি; বরং তার আবেদন অনুযায়ী তার বৈমাত্রিক বোন উম্মু ফারওয়াহ রা. কে তার সাথে বিয়ে দেন। (Ali 2013, 347)

এ ঘটনায় দেখা যায়, আন্তরিকভাবে তাওবার মাধ্যমে সংশোধন হওয়ায় 'ইসলামী দণ্ডবিধি'র মৌলিক উদ্দেশ্য অর্জিত হলে আশ'আসকে শাস্তির আওতায় আনা হয়নি। ছাড় দেয়ার পাশাপাশি তার অভিপ্রায় পূরণে সহায়তা দেয়া হয়েছে।

এছাড়া প্রত্যাশিত সংশোধন না হলেই স্ত্রীকে শাস্তির অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। যেমন অবাধ্য, পাপাচারী স্ত্রীদের সংশোধনের স্তর বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا﴾

স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, অতঃপর তাদের শয্যা বর্জন করো, অতঃপর তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। (Al-Qurān, 4:34)

ইমাম রাযী [৫৪৪-৬০৬ হি.] রহ. বলেন, আল্লাহ এখানে প্রথমে উপদেশ দিয়ে শুরু করেছেন, অতঃপর শয্যা ত্যাগ, অতঃপর প্রহারের কথা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করেছেন। যা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, সহজ পন্থায় অর্থাৎ উপদেশ দ্বারা যদি উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তথা সংশোধিত হয় তবে সেখানেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। আর কঠিন পন্থায় অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। (Al-Rājī 2000, 10/73)

অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, শাস্তির উদ্দেশ্য হলো সংশোধন করা। কারণ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, অবাধ্য স্ত্রীর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রক্রিয়া অনুসরণে অনুগত তথা সংশোধন হলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করা তথা পদক্ষেপ নেয়া নিষিদ্ধ।

রাগের প্রশমন ও সান্ত্বনা দান

মানুষ যখন কারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন স্বাভাবিকভাবে তার অন্তরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় অনিষ্ঠকারীকে শাস্তি দেয়া হলে তার ক্রোধ প্রশমিত হয়। ইসলামের শত্রুদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ - وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। তোমাদের হাতে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে অপমানিত করবেন, তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন। আর তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (Al-Qurān, 9:14-15)

উপর্যুক্ত আয়াতের ভাষ্যমতে, অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে পারলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের রাগ প্রশমিত হয় এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। মানবদেহের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ ক্ষতিগ্রস্ত ও তার অভিভাবকদের অন্তরে ক্রোধ, বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে। অপরাধীকে যখন শাস্তি দেয়া হয় এবং হদ্দ কার্যকর করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা তার উত্তরাধিকারী বা নিকটাত্মীয়গণ উপস্থিত থাকে তখন তা তাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়। অন্তরে যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল তা নিভিয়ে দেয়, তাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত করে না (Al-Wad'ān 2002, 28)। আর এ সুযোগ

না থাকলে তারাও নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করত প্রতিপক্ষের ওপর সীমালঙ্ঘন করার সমূহ সম্ভাবনা থাকত।

ভারসাম্যপূর্ণ দণ্ডবিধি প্রণয়ন

ইসলামের পূর্বে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডবিধি চালু ছিল। যেমন ইয়াহূদীরা হত্যার দণ্ড হিসেবে কেবল হত্যাকে আবশ্যক করে নিয়েছিল, খ্রিস্টানরা কেবল 'ক্ষমা করা' আবশ্যক করে নিয়েছিল এবং আরবরা কখনও হত্যাকে আবার কখনও 'দিয়াত' আবশ্যক করে নিত। তবে আরবরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করত (Al-Rājī 2000, 5/40)। এসবের পরিবর্তে ভারসাম্যপূর্ণ একটি দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা ইসলামী দণ্ডবিধির অন্যতম উদ্দেশ্য। হত্যার শাস্তি কিসাসের পাশাপাশি ক্ষমা ও দিয়াতের সুযোগ রেখে মহান আল্লাহ বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের পরিবর্তে ক্রীতদাস ও নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করে দেয়া হলে ন্যায়নীতির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এটি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সহজীকরণ ও অনুগ্রহ। এর পরেও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (Al-Qurān, 2:178)

উক্ত আয়াতে দেখা যায়, হত্যার পরিবর্তে হত্যার দণ্ড যেমন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ক্ষমার সুযোগও রাখা হয়েছে। ইয়াহূদীদের গৃহীত নীতি 'হত্যার পরিবর্তে কেবল হত্যার দণ্ড'-এর বিকল্প রাখা হয়েছে। তবে খ্রিস্টানদের মতো গণহারে 'ক্ষমা' প্রদর্শনের উদারনীতি অবলম্বন করে অপরাধের অবারিত সুযোগ করে দেয়া হয়নি। বরং উদারতা ও কঠোরতা উভয়ের সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ধারা অব্যাহত রাখা

আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা ইসলামে নতুন কোনো বিধান নয়; বরং এটি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ক্ষেত্রে সে যুগের নবীদের পক্ষ থেকে আনিত বিধানের ধারাবাহিকতা। যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।[৪] মহান আল্লাহর বাণী-

৪. কুরআনে উল্লেখিত কয়েকটি ন্যায়বিচারের ঘটনা হলো: বনী ইসরাঈল কর্তৃক গরুর বাছুর পূজার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড (২: ৫৪), বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি কর্তৃক চাচাকে হত্যার রহস্য উদঘাটন (২: ৬৭-৭৩), ছাগল কর্তৃক ক্ষেত ধ্বংসের ঘটনায় সুলায়মান

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাঁদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (Al-Qurān, 57:25)

এ আয়াত প্রসঙ্গে ইবনু তাইমিয়াহ [৬৬১-৭২৮ হি.] রহ. বলেন, রাসূল এবং কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে আল্লাহর হক এবং সৃষ্টির হক প্রতিষ্ঠা করে। (Ibn Taimiyyah ND, 1/37)

আল্লাহর হক এবং সৃষ্টির হক প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে সে বাধা অপসারণে শাস্তির বিধান রাখা যুক্তিসঙ্গত। এজন্য পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে অপরাধের দায়ে দণ্ডবিধির প্রচলন ছিল। ইয়াহূদীদের দণ্ডবিধি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, চোখের পরিবর্তে চোখ, নাকের পরিবর্তে নাক, কানের পরিবর্তে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং আঘাতের পরিবর্তে অনুরূপ আঘাত। অতঃপর কেউ ক্ষমা করলে এতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিচার করে না, তারাই অত্যাচারী। (Al-Qurān, 5:45)

ইয়াহূদী ধর্মে প্রবর্তিত কিসাসের এ বিধান ইসলামী দণ্ডবিধিতে বহাল রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিধানও ইসলামী আইনে বিধিবদ্ধ করে যুগে যুগে নবী-রাসূলদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুন্নাত অব্যাহত রাখা হয়েছে। তবে বর্তমানে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় এসব শাস্তি কার্যকর করে না।

সাম্য প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামের দণ্ড বিধান কেবল অপরাধীকে শাস্তিদানের জন্য নয়; বরং আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আবূ জাহরা [১৮৯৮-১৯৭৪ খ্রি.] রহ. বলেন,

والقصاص كان لتحقيق المساواة بين احاد الأمة.

আর কিসাস প্রবর্তন করা হয়েছে জাতির প্রত্যেকের মাঝে সমতা নিশ্চিত করার জন্য। (Abū Jahrah 1998, 49)

আ.-এর বিচার (২১:৭৮-৭৯), দুম্বা নিয়ে বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যে দাউদ আ. কর্তৃক বিচার (৩৮: ২১-২৬)।

ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধীর সামাজিক মর্যাদাভেদে শাস্তির তারতম্য করা হত, ক্ষেত্র বিশেষে বেকসুর খালাসও দেয়া হত। প্রচলিত আইনে এখনও ফাঁক ফোকর দিয়ে অপরাধীকে রেহাই দেয়ার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। এতে 'আইনের চোখে সবাই সমান' এ নীতি ভূলুণ্ঠিত হয়; বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। এমন অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই ইসলামী আইনের মূল লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় মাখযূম গোত্রের এক মহিলা চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডের মুখোমুখি হয়। বিষয়টি বংশের আভিজাত্যে চপেটাঘাত মনে করে বিবেচনার জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষিপ্ত এক ভাষণে বলেন-

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অপরদিকে যখন কোনো সহায়হীন দরিদ্র সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার ওপর হদ্দ (হাতকাটার দণ্ড) প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তবে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে ফেলতাম। (Al-Bukhārī 1987, 3278)

ইসলামী আইনে কারও প্রতি অনুরাগ-বিরাগের সুযোগ নেই। প্রতিপক্ষের হুমকি, অর্থের মোহ কিংবা ক্ষমতার লালসা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে সবার প্রতি আইনী সমতা প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। অপরাধ দমনে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকলে এ সাম্য রক্ষা করা সম্ভব। কারণ ভয় কিংবা প্রলোভনে পড়ে কেউ বৈষম্যমূলক বিচার করতে চাইলেও বিধিবদ্ধ আইনের কারণে তা সম্ভব হয় না।

দীন নিয়ে উপহাস বন্ধ করা

ইসলামী শরী'আতের কিছু দণ্ড প্রবর্তন করা হয়েছে- দীনের সংরক্ষণ করা এবং তা নিয়ে খেল তামাশা বন্ধ করার জন্য। যেমন মুরতাদের শাস্তি। কারণ সে দীন নিয়ে তামাশাকারী এবং সাধারণ শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী। সুতরাং তার খেল তামাশা থেকে দীনকে সংরক্ষণ করার জন্য শাস্তির বিধান যুক্তিসঙ্গত। যারা ঈমান নিয়ে খেল-তামাশা করে তাদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী-

﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব- কারণ তারা অপরাধী। (Al-Qurān, 9:66)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

> আর যখন আমার কোনো আয়াত সে (পাপী) অবগত হয় তখন তা নিয়ে উপহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (Al-Qurān, 45:9)

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ের ভিত্তিতে বলা যায়, আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে উপহাস করা গুরুতর অপরাধ। আর তা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যাতে এ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি সতর্ক হয়। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে আবূ বাকর রা.-এর দৃঢ় পদক্ষেপ দীন ইসলামকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করা থেকে রক্ষা করে।

হয়রানি বন্ধ করা

আইন ও বিচারের আওতায় অপরাধ বন্ধে সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকলে মানুষ ইচ্ছামত দণ্ডবিধি আরোপ করবে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যে কাউকে ফাঁসানোর অপচেষ্টা চালাতে পারে। এ ধরনের হয়রানির পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে ইসলাম প্রণয়ন করেছে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি (Al-Qurān, 24:4)। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলে আইনী প্রক্রিয়ায় তার বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া সময়সাপেক্ষ। এমতাবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও ততদিনে সমাজে ধিকৃত হয়, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়, আইনী মোকাবেলা করতে গিয়ে শারীরিক এবং আর্থিকভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দিকা রা.-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার পর তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ, আয়িশা রা. এমনকি মুসলমানরাও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। অপবাদের শাস্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হয়রানির পথ বন্ধ হয়ে যায়।

রহমত প্রাপ্তি

ইসলামী আইনে দণ্ড প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো রহমত। কারণ এতে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। ইবনু তাইমিয়াহ রহ. বলেন,

> শার'ঈ দণ্ডবিধি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য রহমত হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি সৃষ্টির প্রতি রহমত ও ইহসান হিসেবেই জারিকৃত। (Ibn Taimiyyah 1987, 5/521)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্ধারিত কোনো একটি দণ্ড কার্যকর করা মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও কল্যাণ বয়ে আনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> إقامة حد من حدود الله خيرمن مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز و جل
>
> আল্লাহর বিধানকৃত হদ্দসমূহের কোনো একটি কার্যকর করা তাঁর নগরগুলোতে চল্লিশ রাত (রহমতের) বৃষ্টি বর্ষণের চেয়েও উত্তম। (Ibn Mājah ND, 2537)

আর এ রহমত কেবল ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের জন্য নয়; বরং অপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতিও এটি ইহসান ও রহমত হিসেবে গণ্য। যেমন পিতার উদ্দেশ্য (শাসনের মাধ্যমে) সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং ডাক্তারের উদ্দেশ্য (অস্ত্রোপচার দ্বারা) রোগীর চিকিৎসা করা। এ প্রসঙ্গে ইবনু তাইমিয়াহ রহ. বলেন-

> শার'ঈ দণ্ডবিধি পুরোটাই উপকারী ঔষধ, যা দ্বারা আল্লাহ অন্তরের ব্যাধিসমূহ সুস্থ করে দেন। আর তা হলো বান্দাহর প্রতি আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত সহানুভূতি যে, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি" (Al-Qurān, 21:107)। অতএব যে ব্যক্তি রোগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এ উপকারী রহমতকে পরিত্যাগ করে সে যেন তার প্রতি শাস্তি ও ধ্বংসের কাজে সহায়তা করল। (Ibn Taimiyyah 2005, 15/290)

যেসব কাজ উক্ত আয়াতে উদ্দেশ্যকৃত রহমতের অন্তর্ভুক্ত তা হলো- মানুষের অজ্ঞতা দূর করা, পথভ্রষ্টতা হতে সৎ পথে নিয়ে আসা, পাপাচার হতে বিরত রাখা এবং আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা (Al-Mawrdī 1427H, 325)।

আর পাপাচার প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থা না নিলে তখন আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যায়। সায়্যিদুনা আবূ বাকর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

> إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أوشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ
>
> লোকেরা যখন অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখল অথচ তার হাত ধরল না তথা বাধা প্রদান করল না, তখন সাধারণভাবে সকলের ওপর আল্লাহ অচিরেই শাস্তি প্রদান করবেন। (Al-Tirmidī, ND, 2168)

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পাপাচার হতে বিরত রাখার জন্য উপদেশমূলক বক্তব্যে সফল না হলে কখনও কখনও কঠোর হতে হয়, যার চূড়ান্ত পর্যায় হলো শাস্তি নিশ্চিত করা।

প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য

মানবরচিত আইন স্থির নয়। সময়-কালের বিবর্তনে আইনের পরিবর্তন হয়। ফলে অপরাধের সংজ্ঞায়ও পরিবর্তন আসে। একই সমাজে কোনো একটি কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার পর কালের বিবর্তনে তা বৈধতাও পেয়ে থাকে। অনুরূপভাবে একই আচরণ কোনো সমাজে অপরাধ হিসেবে গণ্য হলেও অন্য সমাজে তা অনুমোদিত হতে পারে। যেমন- দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপীয় সমাজে রাষ্ট্র এবং ধর্মের বিরুদ্ধে যে কোনো কাজকেই কেবল অপরাধ হিসেবে আখ্যা দেয়া হত। কিন্তু হত্যাকে তখনও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হত না (Khan & Qader 2014, 65)। আইনে স্থিতিশীলতা না থাকলে আইনের উদ্দেশ্যেও পরিবর্তন আসে। প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে প্রচলিত আইনে শাস্তির উল্লেখযোগ্য মতবাদ হলো-

- প্রতিশোধমূলক মতবাদ
- নিবারণমূলক মতবাদ
- প্রতিরোধমূলক মতবাদ
- সংশোধনমূলক মতবাদ (Kabir 2010, 51)

প্রতিশোধমূলক মতবাদ

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আঘাতের অনুরূপ- অপরাধীকে আঘাত করা হলো এ মতবাদের মূলকথা। প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে শাস্তির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করার এ প্রয়াস সবচেয়ে প্রাচীন। হাম্মুরাবী আইনে 'চোখের পরিবর্তে চোখ, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত' এ নীতিতে প্রতিশোধমূলক মতবাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় (Karzon 2011, 240)। অনুরূপভাবে ইয়াহুদী ধর্মেও এ মতবাদের প্রচলন ছিল, যা ইসলাম ধর্মেও বহাল রাখা হয় (Al-Qurān, 5 : 45)। প্রচলিত আইনে খুনের শাস্তি (PC- 1860, Sec : 302) এবং খুনসহ ডাকাতির শাস্তি (Ibid, Sec : 396) হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান মূলত প্রতিশোধ তত্ত্বেরই অংশ। অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে এ মতবাদের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হলেও আধুনিক যুগে অনেকে প্রতিশোধমূলক শাস্তিকে অমানবিক ও বর্বর উল্লেখ করে এ তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন (Kabir 2010, 51; Karzon 2011, 240)। এমনকি বর্তমানে বিশ্বে ৮২% দেশ হতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি তুলে দেয়া হয়েছে (Awal 2017, 23)।

নিবারণমূলক মতবাদ

নিবারণমূলক বলতে কোনো কাজে বাধা প্রদানকে বোঝানো হয়। এ তত্ত্ব অনুসারে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিচারের উদ্দেশ্য হলো লোকজনকে অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখা, অন্যকে এমন শিক্ষা প্রদান করা যাতে তারা অপরাধমূলক চিন্তা এবং কর্মে প্রলুব্ধ হতে না পারে (Khan & Qader 2014, 317)। প্রচলিত আইনে কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড বিধিবদ্ধ করার মাধ্যমে অপরাধপ্রবণ মানুষকে নিবারণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়, যাতে সকল স্তরের মানুষের মনে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রতিরোধমূলক মতবাদ

প্রতিরোধমূলক মতবাদ হলো, কোনো বিশেষ অপরাধীকে এমনভাবে দুর্বল, অক্ষম বা ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা, যাতে সে পুনরায় অপরাধের সুযোগ না পায় এবং পেলেও যাতে সে সুযোগের আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে (Khan & Qader 2014, 318)। অপরাধবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে অপরাধীকে কারারুদ্ধ করাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কারণ এ পদ্ধতিতে অপরাধীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং সামাজিক মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় (Karzon 2011, 240)। প্রচলিত আইনে ডাকাতির শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে (PC- 1860, Sec : 395) প্রতিরোধমূলক তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটে। কারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে ৩০ বছর কারাভোগের পর (ibid, Sec : 57) অধিকাংশ অপরাধীই বয়স, সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে।

সংশোধনমূলক মতবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাধবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রতিশোধ, নিবারণ ও প্রতিরোধের চেয়ে তারা সংশোধনের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করেন। এ

মতবাদের লক্ষ্য হলো- অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে বুঝার সুযোগ দেয়া এবং অপরাধীর চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে সমাজে পুনর্বাসন করা (Khan & Qader 2014, 318)। বিভিন্ন রোগের মতো অপরাধকেও একটি রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে তার কারণ নির্ণয়পূর্বক যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা (Kabir 2010, 51)। এ তত্ত্ব বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও সফলতা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও বর্তমানে এ মতবাদ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রচলিত আইনে যেসব তত্ত্বকে শাস্তির উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা হয়, এর অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে শাস্তির উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে। তবে শাস্তি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে সেসব উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে অর্জিত হয় না। যেমন-

১. প্রতিশোধমূলক মতবাদ : হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে (PC- 1860, Sec : 302)। ফলে কোনো ব্যক্তি অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হলেও তাকে কতটুকু শাস্তি দিবে তা নির্ভর করে বিচারকের ইচ্ছার ওপর (Khan & Qader 2014, 418)। এতে প্রতিশোধমূলক তত্ত্ব বাধাগ্রস্ত হয়। আর ইসলামী আইনে প্রাণহানি কিংবা অঙ্গহানির শাস্তি হিসেবে কিসাসের বিধান বাহ্যত প্রতিশোধস্বরূপ হলেও প্রচলিত অর্থে প্রতিশোধমূলক নয়। কারণ প্রতিশোধমূলক শব্দটিতে শত্রুতা, প্রতিহিংসা, অসংবৃত ক্রোধ, রক্তপাতের অত্যুৎসাহ এবং তাতে অন্যদেরও শরীক হওয়ার জন্য উত্তেজিত করা বোঝায় (Rahīm 2010, 220)। এজন্য ইসলামী আইনে কিসাস তথা সমতা বিধান পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া কিসাসের মাধ্যমে আইনী প্রক্রিয়ায় প্রতিশোধের বিধান রাখা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে দিয়াতের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ইসলামী আইনে (Al-Qurān, 2:178)।

২. মৃত্যুদণ্ড: অপরাধবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে খুনের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকে প্রতিশোধমূলক মনে করা হলেও সমাজে এর খুব বেশি প্রভাব পড়ে না। কারণ, কারাগারের গোপন কুঠরিতে এত গোপনীয়তা সহকারে কার্যকর করা হয় যে, সেই কারাগারের অন্যান্য কয়েদীরা তা দেখা তো দূরের কথা, টেরও পায় না (Rahīm 2010, 176)। আবার অনেক সময় তা প্রচার না করায় দণ্ড আদৌ কার্যকর করা হলো কিনা তা জানা যায় না। বিপরীতে ইসলামী আইনে একদল প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতিতে শাস্তি কার্যকর করাকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে (Al-Qurān, 24:2)। এতে যারা উপস্থিত থেকে শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। অতঃপর এ ঘটনা ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্ম তা থেকে উপদেশ লাভ করে (Ibn al-'Arabī 1424H, 3/335)। প্রচলিত আইনে অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকেও সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ক্ষমা করে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইসলামী

আইনে দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ দেয়নি ইসলাম। ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

আল্লাহর বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে (Al-Qurān, 24:2)।

৩. কারাদণ্ড: প্রচলিত আইনে যাবজ্জীবন, নির্দিষ্ট মেয়াদে সশ্রম কিংবা বিনাশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। অপরাধবিজ্ঞানীরা কারাদণ্ড প্রদানকে প্রতিরোধমূলক কিংবা নিবারণমূলক তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালালেও উদ্দেশ্য পুরোমাত্রায় অর্জিত হয় না। কারণ কারাগারে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্তদের একত্রে রাখায় অনেক সময় ছোট অপরাধী ভয়ংকর অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে আরও অপরাধের কৌশল রপ্ত করে। ফলে সে যখন নির্দিষ্ট সময় পরে বেরিয়ে আসে তখন সে সমাজের জন্য আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে (Al-Amīr ND. 33)। বর্তমান কারা ব্যবস্থায় বন্দীদের পরস্পরের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ থাকার কারণে অপরাধীরা বন্দী হয়েও কারাগারের চার প্রাচীরের অভ্যন্তরে অপরিচিতির অস্বস্তি ভোগ করে না (Ali 2015, 317)। এমনকি কারাগারে বসে অপরাধ পরিচালনার মতো ঘটনাও ঘটে।[৫] ধারণক্ষমতার চেয়ে অধিকসংখ্যক বন্দীর কারণেও কারাদণ্ড প্রদান করে সংশোধন করার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।[৬] তাছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে এক প্রকার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়; চাকুরীচ্যুত হওয়া, উপার্জন বন্ধ হওয়ার কারণে পরিবারের নিরপরাধ সদস্যগণও এক প্রকার শাস্তি ভোগ করে (Al-Amīr ND. 34)। বিপরীতে চুরির দায়ে কারাদণ্ডের পরিবর্তে ইসলামী আইনে হাতকাটার বিধান কার্যকরণে নিবারণ কিংবা প্রতিরোধমূলক মতবাদ বাস্তবায়িত হয় যথাযথভাবে।

৪. অর্থদণ্ড : প্রচলিত আইনে অধিকাংশ অপরাধে অভিযুক্তকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান আছে। কিন্তু অপরাধীর অপরাধের দ্বারা যে পরিমাণে কোনো ব্যক্তি বা তার উত্তরাধিকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার সাথে অর্থদণ্ডের পরিমাণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।[৭] তাছাড়া এ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দানের বাধ্যবাধকতা নেই; বরং সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে (CRPC- 1898, 545)। অপরাধের তুলনায় অর্থদণ্ডের পরিমাণ নিতান্তই কম হওয়ায় অর্থদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সুদূর পরাহত।

৫. কারাগারে বসেই খুনের নির্দেশ (The Daily Prothom Alo. 2019, May 18); কারাগারে বসেই চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করছেন টিনু। (The Daily Samakal. 2019. October 27).

৬. সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য মতে, বর্তমানে কারাগারে বন্দী ধারণক্ষমতা ৪০ হাজার ৯৪৪ জন, কারাবন্দীর সংখ্যা ৮৮ হাজার ৮৪ জন। (The Daily Prothom Alo. 2020. March 01)।

৭. দণ্ডবিধির ধারা : ৩৩৫, ১৫৪, ১৩৭, ২৬৩ক, ৫১০-এ ধার্যকৃত অর্থদণ্ডের পরিমাণ যথাক্রমে ২০০০, ১০০০, ৫০০, ২০০, ১০ টাকা।

অপরাধীর অপরাধ দ্বারা যে ক্ষতি হয় তার সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থদণ্ডের টাকা আসামীর নিকট থেকে আদায়পূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা নেয়া হলে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ প্রতিপত্তিহীন ও গরীব লোকদের নির্যাতন করে যে সকল অপরাধ করেন তার সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

৫. সংশোধনমূলক মতবাদ : প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য হিসেবে সংশোধনমূলক মতবাদ বর্তমানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও সংশোধনের পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। নিবারণ কিংবা প্রতিরোধের পাশাপাশি সংশোধনমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারলে অপরাধ দমনে শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী আইন সফল হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। মা'ইয রা. স্বেচ্ছায় ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হদ্দ প্রয়োগের আবেদন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিনবার তা এড়িয়ে যান, চতুর্থবার একই আবেদন করলে হদ্দ প্রয়োগের নির্দেশ দেন (Abū-Dāūd ND, 4421)। শাস্তির ভয়াবহতা জেনেও অপরাধ স্বীকার করে দণ্ডের আবেদন– আইন ও বিচারের ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

৬. দণ্ড প্রদানে দ্বৈতনীতি : মাদককে বলা হয় সকল অপরাধের উৎস (Al-Nasāee 1991, 5176)। মাদকের ক্ষয়ক্ষতি সবার ক্ষেত্রে একই হলেও প্রচলিত আইনে শ্রেণি, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়নি। কাউকে কাউকে ছাড় দেয়া হয়েছে (Drug Control Act 2018. Sec : 11)। তাছাড়া ক্ষেত্র ও ব্যক্তিবিশেষে মাদকের ব্যবহার, পরিবহন, বিপণন প্রভৃতির লাইসেন্স, অনুমোদন প্রদানের সুযোগ রয়েছে (ibid. Sec : 13), যা মাদকের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধের পথে অন্তরায়।

সুপারিশমালা

১. রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ইসলামী দণ্ডবিধি' প্রচলিত না থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এ সম্পর্কিত জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। এমনকি এ সম্পর্কে অনেকের মাঝে বিরূপ মনোভাবও কাজ করে। সুতরাং ইসলামী আইনে শাস্তির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জনগণকে অবহিতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে, যেন 'ইসলামী দণ্ডবিধি' মানার মানসিকতা তৈরি হয়।

২. তা'যীরী দণ্ড তথা যেসব অপরাধের শাস্তি শাসক এবং বিচারকের বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে, তা নির্ধারণে শাস্তির উদ্দেশ্য যেন অর্জিত হয় তার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

৩. অপরাধ দমনে চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের জন্য প্রচলিত আইনে হুদূদ ও কিসাসকে বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে তা'যীরী দণ্ডের ক্ষেত্রে অপরাধের ধরন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে সমন্বয় করা সময়ের দাবি।

৪. দণ্ড ভোগের পর অভিভযুক্তকে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে দেয়া নয়; বরং সংশোধন ও সৎ পথে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য হিসেবে যেসব তত্ত্ব রয়েছে, তার সুফল পেতে শাস্তি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে সংস্কার প্রয়োজন।

৬. অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি পরিবর্তনের সাথে সাথে অপরাধ দমনের কৌশলও পরিমার্জিত করতে হবে।

৭. ক্রমবর্ধমান অপরাধ ঠেকাতে আইন প্রণেতাগণ 'ইসলামী দণ্ডবিধি'কে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে আইন ও বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজালে শান্তিপূর্ণ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

উপসংহার

শাস্তি হলো মানুষের অপকর্মের প্রতিফল, যা সামাজিক কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে অপরাধীর বিরুদ্ধে নির্ধারণ করা হয়। আর এ শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেন কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করা যায়, সেজন্য ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনে শাস্তির কতিপয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে। উভয় আইনের উদ্দেশ্যসমূহে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও প্রক্রিয়াগতভাবে ভিন্নতা রয়েছে। প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্য ইতিবাচক হলেও পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে আইন সংস্কার এবং বারবার কৌশল পরিবর্তন করেও অপরাধের মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলছে। অপরাধের শিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। এতে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। এমন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দানের লক্ষ্যে ইসলামী আইনে ভারসাম্যপূর্ণ দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একদল প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতিতে দণ্ড কার্যকর করাকে বিধিবদ্ধ করা হয়। অপরাধপ্রবণ মানুষকে সংশোধনপূর্বক অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের ওপর জোর দেয় ইসলামের শাস্তি আইন। অতএব, আইন ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 'ইসলামী দণ্ডবিধি'র আলোকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অপরাধ দমনে কাঙ্খিত সফলতার প্রত্যাশা করা যায়।

Bibliography

Al-Qurān Al-Karīm.

'Audah, `Abdul Qādir. ND, *at-Tasrī' al- al-Zināē al-Islāmī Muqārinan bi al-Qānūn al-Wad'ē*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abū Jahrah, al-Imām Muhammad. 1998. *al-Jarīmah*. Cairo : Dār al-Fikr al-`Arabī.

Abū-Dāūd, Sulaimān Ibn Ashath al-Sijistānī. ND. *al-Sunan*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī.

Ahmad, Mawlana Mushtaq. 2006. *Islamer Dristhite Ain o Bichar*. Dhaka: Nadia Book Corner.

Al-'Atībī, Saūd ibn 'Abd al-'Alī al-Bārūdī. 1427H. *al-Mawsū'ah al-Zināyyah al-Islāmiyyah al-Muqārinah bil Anjumah al-M'amūl biha fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Saūdiyyah*. Riād: N.P.

Al-Amir al-Sheikh. ND. *al-Sharīah fi al-Islam wa al-Nasrāniyah wa al-Yahudiyah*. www.islamland.com

Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'īl, 1987. *al-Sahīh*, Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Damasqī, Ābū Hafs 'umar ibn 'Alī. 1419H. *al-Lubāb fī 'Ulūm al-Kitāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ali, Dr. Ahmad. 2013. *Abu Bakar As Siddique (Ra.)*, Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Ali, Dr. Ahmad. 2015. *Islamer Shasti Ain*, Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Al-Māwardī, Abul Hasan 'Alī ibn Muhammad Habīb. 1427H. *al-Ahkām al- Sultāniyyah*. commentary of Ahmad Zād. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. 1427H. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Nasāī, Abū `Abd al-Rahmān Ahmad ibn Shu`aib. 1991. *al-Sunan al-Kubra*, commentary of Dr. Abd al-Gaffār Sulaimān. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qurtubī, Abū 'Abduullah Muhammad ibn Ahmad. 2003. *al-Jāmi' li Ahkām al- Qurān*. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub.

Al-Rājī, Fakruddīn Muhammad ibn 'Umar. 2000. *Mafātīh al-Gaib*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Rizkī, Dr. Muhammad al-Tāhir. 2008. *Manobadhikar o Dandabidi*. Translated by Hafez Mawlana Akram Faruqe. Dhaka: Islamic Law Research Centre & Legal Aid Bangladesh.

Al-Shātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā. 1997. *al-Muwāfaqāt*. commentary of Abū 'Ubaydah. NP: Dār Ibn 'Affān.

Al-Tirmidī, Abū ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa. ND. *al-Sunan*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al- ‘Arabī.

Al-Wad‘ān, Dr. Ibrāhīm ibn Fahad. 2002. *al-‘Afu ‘an al-‘Uqūbah wa Asruhu bain al- Sharī‘ah wa al-Qānūn*. https://static.alukah.net/Researches/Files/Rsrch_813

Amer, Dr. Abdul Aziz. 2012. *Islami Dandabidi*. Translated by Shahidul Islam. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research & Legal Aid Centre.

Awal, M. A. 2017. *Ainer Moulik Bishoy*. Dhaka: Islamic Foundation.

Baalbaki, Dr. Rohī. 1995. *Al-Mawrid*. Beirut: Dār al-Ilm lilmalāyīn.

BD Police. https://www.police.gov.bd/en/crime_statistic/year/ Date : 26.03.2020

CRPC, Criminal Procedure-1898.

Drug Control Act- 2018.

Hoque, Dr. Muhammad Enamul. 2005. *Baboharik Bangla Ovidhan*. Dhaka: Bangla Academy.

Ibn ‘Abd al-Bar, Abū ‘Umar. 1412H. *al-Isti‘āb fī M‘arifah al-Ashāb*. Beirut: Dār al-Jail.

Ibn ‘Āsūr, Muhammad al-Tāhir. 2005. *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Cairo: Dār al-Salām.

Ibn al-‘Arabī, Abū Bakar Mohammad ibn ‘Abdullah. 1424H. *Ahkām al-Qurān*, commentary of ‘Abd al-Qādir ‘Atā. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Mājah, Muhammad ibn Yajīd. ND. *Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukarrom al-Afrīqī al-Misrī. N.D. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār sādir.

Ibn Qudāmah, abū Mohammad `Abdullah al-Maqdisī, *al-kāfi fī Fiqhi ibn Hambal*. N.D. edition : Maktabah al-Shāmilah

Ibn Taimiyyah, Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm. 1987. *al-Fatāwā al-Kubrā*. NP: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Taimiyyah, Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm. 2005. *Majmū‘al-Fatāwā*. NP: Dār al- Wafā.

Ibn Taimiyyah, Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm. ND. *al-Siāsah al-Shar‘iyyah fī Islāh al-Rā‘ē wa al-Ra‘ēyyah*. NP: Dār al-Ma‘rifah.

IFA. 2004. *Bidhibaddo Islami Ain*. Dhaka: Islamic Foundation.

IFA. 2010. *Arabi-Bangla Abhidhan*. Dhaka: Islamic Foundation.

Kabir, Dr. L. 2011. *Lectures on the Penal Code*. Dhaka : Ain Prokashan.

Karzon, Sheikh Hafizur Rahman. 2011. *Theoretical and Applied Criminology*. Dhaka : Palal Prokashoni.

Khan, Professor Dr. Burhan & Qader, Manjur. 2014. *Oparad Bigghan Pariciti*. Dhaka: Kamrul Book House.

Muslim, Abū al-Husain Muslim ibn Hajjāj. *al-Sahīh*. ND. Beirut: Dār al-Jail.

PC, The Penal Code- 1860.

Rahim, Moulana Muhammad Abdur. 2010. *Oporadh Protirodhe Islam*. Dhaka : Khairun Prokashani.

Rawās, Dr. Muhammad & Sādiq, Dr. Hāmid. 1988. *Mu‘zam Lugah al-Fuqāhā*. Beirut: Dār al-Nafāis.

Shafī, Hazrat Mawlana Muftī Muhammad. 1413H. *Tafsīr Ma‘ārif al-Qurān*. Translated by Mawlana Muhiuddin Khan. al-Madīnah al-Munauwara: Ministry of Hajj and Awqaf.

The Daily Prothom Alo. 2019, May 18; 2020. March 01.

The Daily Samakal. 2019. October 27.

Uddin, MD. Burhan. 2017. *Oparad Bigghan*. Dhaka: Shams Publication.